104

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

প্রসঙ্গ বিসিএস পরীক্ষা

কথায় আছে, 'ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টে নৈর্ব্যক্তিকমূলক প্রশ্নের উত্তর সেই ভাবে অনুমানের ওপর দিয়ে অনেক অযোগ্য পরীক্ষার্থী উঁচু হারে নম্বর পাচ্ছে। মেধাবীদের মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না ঠিক ভাবে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত শূন্যপদে

এস. এম. আলী আজম

নিয়োগের জন্য পিএসসি 'বিসিএস পরীক্ষা' নিয়ে থাকে। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পদের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পিএসসি দশম বিসিএস পরীক্ষা থেকে প্রিলিমিনারি টেস্টের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রার্থী ছাঁটাই করে দেয়। ১৫শ' বিসিএস-এ শূন্যপদ ও প্রার্থীর অনুপাত ছিল ১:৫১। প্রচলিত অবজেকটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগী বাছাই বলা যায় অনেকটা অবৈজ্ঞানিক এক পদ্ধতি।

উন্নত দেশের যে কোন কিছু আমদানি করতে আমরা অভ্যস্ত। দরিদ্র জনবহুল এদেশে বাইরের যে কোন পদ্ধতি বা কৌশল সব সময় যে কার্যকর হবে, বলা কঠিন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবজেকটিভ প্রথা চালু করে আমাদের ছাত্র সমাজকে কিভাবে জ্ঞানচর্চায় বিমুখ করা হচ্ছে তা কি নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে?

বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টে এক শ'টি অবজেকটিভ প্রশ্ন থাকে এবং প্রতিটি প্রশ্নের সাথে একটি সঠিক উত্তর ও তিনটি ভুল উত্তর দেয়া থাকে। প্রদত্ত চারটি উত্তর থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে হয়। প্রদত্ত চারটি উত্তরের চারটি নম্বর (ক, খ, গ, ঘ) থাকে এবং এসব নম্বরে বৃত্ত করা থাকে। এ চারটি থেকে সঠিক একটি বৃত্ত পেন্সিল দিয়ে ভরাট করতে হয়। ভুল উত্তরে টিকচিহ্ন দেয়া হলে/ নম্বর ভরাট করলে কোন নম্বর কাটা হয় না। ফলে দেখা যায়, অনেক অযোগ্য পরীক্ষার্থী আন্দাজে উত্তর দিয়ে ভাগ্য গুণে বেশি নম্বর পেয়ে যায়। সাধারণ বিসিএস পরীক্ষায় এ-নম্বর যোগ না করে পরবর্তী পরীক্ষাসমূহের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়। কিন্তু বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় এ নম্বর যোগ করা হয়। গত ১৬ শ' বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা (শিক্ষা)-এর প্রিলিমিনারি টেস্টে দেখা গেছে, অনুমানের ওপর উত্তর দিয়ে অনেক অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রী উঁচু হারে নম্বর পেয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। অনেক মেধাবী ছাত্র সে তুলনায় ভাল করতে পারেনি। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে দরকার মেধার, পরিশ্রমের। পরীক্ষা ভাগ্যনির্ভর নয়। পরীক্ষার ক্ষেত্রে লটারী বা ভাগ্যমূলক পদ্ধতির স্থান নেই। অথচ প্রচলিত বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট লটারীর মতোই ভাগ্যনির্ভর হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থা নিরসনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরী। যেমন ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা এবং সংক্ষেপে বা এককথায় উত্তরদানের পদ্ধতি রাখা।

নম্বর কাটার পদ্ধতি- ভুল উত্তর প্রদানের জন্য নম্বর কাটার ব্যবস্থা থাকলে আন্দাজে উত্তর প্রদানের প্রবণতা অনেটা হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে বেশি ভুল উত্তরের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে নম্বর কাটার ব্যবস্থা রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথম (১ হতে ১০টি) সর্বোচ্চ ১০টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যায়। এরপর ৮টি ভুলের জন্য ১ নম্বর, এরপর ৫টি ভুলের জন্য ১ নম্বর এবং এরপর ৩টি ভুলের জন্য ১ নম্বর কাটা যায়। তাহলে প্রথম ছাব্বিশটি (১০+৮+৫+৩=২৬) ভুলের জন্য মোট চার (১+১+১+১=৪) নম্বর কাটা যাবে। এরপরও যদি কেউ ভুল উত্তর দেয় তাহলে প্রতি ১টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যায়। এভাবে ভুল উত্তর প্রদানের জন্য নম্বর কাটার ব্যবস্থা থাকলে অনুমানের ওপর উত্তর প্রদানের প্রবণতা হ্রাস ও লোপ পেত। মেধার মূল্যায়ন হতো।

সংক্ষেপে/এক কথায় উত্তর দান- প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে সঠিক উত্তরসহ মোট চারটি উত্তর দেয়া থাকে, যা থেকে সঠিক উত্তর শনাক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে চারটি উত্তর থেকে একটি খুঁজে বের করা অনেকটা সহজ ও কম চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার। প্রশ্নপত্রে সম্ভাব্য উত্তর না দিয়ে কেবল প্রশ্ন করা হলে এবং সংক্ষেপে বা এককথায় উত্তর লেখার ব্যবস্থা থাকলে মেধাহীন অযোগ্যরা আন্দাজে উত্তর দানের সুযোগ পেত না। মেধার সঠিক মূল্যায়ন হতো। যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিতে হতো।

যেমন বিষাদসিন্দু উপন্যাসর লেখক কে? এ প্রশ্নের উত্তর ক) গোলাম মোস্তফা, খ) কাজী নজরুল ইসলাম গ) মীর মশাররফ হোসেন, ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক্ষেত্রে এ চারটি উত্তরের একটি সঠিক হবেই। তাই এ চারটির বাইরে আর চিন্তাভাবনা করতে হয় না। এরূপ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি জানাকে সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে। অথচ এ উত্তরগুলোর একটিও না দিয়ে যদি পরীক্ষার্থীকে নিজে থেকে উত্তর লিখতে হতো, তাহলে জানার জন্য তার আগ্রহ বেশি থাকত। প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে এক শ' প্রশ্নোত্তর আন্দাজে টিকচিহ্ন দিলে বা পেন্সিল দিয়ে নম্বর ভরাট করলে এক-চতুর্থাংশ সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব। ভাগ্য ভাল হলে অধিকাংশ বা সব ক'টিও সঠিক হতে পারে। (যদিও সব ক'টি সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি) তাই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরিবর্তে সংক্ষেপে বা এককথায় উত্তর দান পদ্ধতি অবলম্বন করে ভাগ্যনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি উচ্ছেদ করা যায়। আর এভাবেই কেবল মেধার মূল্যায়ন সম্ভব। তাছাড়া প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় ছাত্রদের ইশারায় নকল করার প্রবণতা দেখা গেছে! এই প্রবণতা দূর করার জন্য এককথায় উত্তর দানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিসিএস পরীক্ষার পদ্ধিতি সম্বন্ধে আরও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্টের নামে মাত্র এক শ' প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী ছাঁটাই পন্থা গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে প্রশ্নের সংখ্যা কমপক্ষে দু'শ' থেকে তিন শ' (প্রতিটি ১ নম্বর করে) করা দরকার এবং দু' থেকে তিন ঘণ্টায় পরীক্ষা নেয়া উচিত। মাত্র ১ ঘণ্টার একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী ছাঁটাই অমানবিক ব্যাপার। বড় ধরনের দু'/তিন ঘণ্টার কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হলে অযোগ্যরা বাতিল হয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা টিকে যেত।

চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্টের নম্বর যোগ হওয়া আবশ্যক। যদি নম্বর কাটার প্রথা বা সংক্ষেপে উত্তর দান পদ্ধতি বজায় থাকে, তাহলে প্রিলিমিনারি টেস্টে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্নরাই বেশি নম্বর পাবে এবং তা চূড়ান্তভাবে যোগ করা যায়।

আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান চাকরি প্রদানের নামে প্রার্থীদের থেকে বিরাট অঙ্কের পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট বা জামানত আদায় করে চলেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান আবার দু'একটি পদের জন্য প্রতিবছরই নিয়োগের নামে বেকারদের মাধ্যমে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনও পিছিয়ে নেই। পিএসসি একটি বিসিএস ফরম বিক্রি করে ২৫ টাকায়। এ ফরম পূরণ করে সঙ্গে আড়াই শ' টাকার ব্যাংক ড্রাফট ও একগাদা সনদ/প্রত্যায়ন পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হয়। দেখা যায়, প্রিলিমিনারি টেস্টের মাধ্যমে অর্ধেকের বেশি (প্রায় বিশ/ত্রিশ হাজার) প্রার্থী ছাঁটাই হয়ে যায় মাত্র ১ ঘণ্টার ১টি পরীক্ষায়, যে পরীক্ষায় ছাত্রপ্রতি পঁচিশ টাকা ব্যয় হয় না। অথচ এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে আড়াই শ' টাকার ড্রাফট আদায় করা হয়, যা অমানবিক। এক্ষেত্রে বিসিএস ফরমের মূল্য পঞ্চাশ টাকা করা যায় এবং কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট জমা দেয়ার বিধি থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রিলিমিনারি টেস্টে যারা নির্বাচিত হবে একমাত্র তারাই পরবর্তী পরীক্ষাসমূহের জন্য সর্বোচ্চ দু'শ' টাকার ব্যাংক ড্রাফট পিএসসিতে জমা দিতে পারে। তাহলে যারা প্রিলিমিনারিতে ছাঁটাই হলো তাদের আর ব্যাংক ড্রাফট দিতে হতো না। দেশের বিশাল শিক্ষিত বেকার গোষ্ঠীর জন্য এ ক্ষুদ্র বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত ১৭ শ' বিসিএস পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা পিএসসি'র ভ্রান্ত, অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্র এ দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে প্রচলিত জেলা কোটা মেধাবীদের জন্য অমানবিক ও অভিশাপস্বরূপ। পিএসসি কর্তৃপক্ষকে আসলে সনাতনী এসব মানসিকতা পরিবর্তন করে ঢেলে সাজাতে হবে। জেলা কোটা ও মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন করতে হবে।